প্রথম আলো

কলাম

মতামত

বেসামাল শিক্ষা—পথে ফেরার উপায় কী

মনজুর আহমদ

প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১৭: ১০

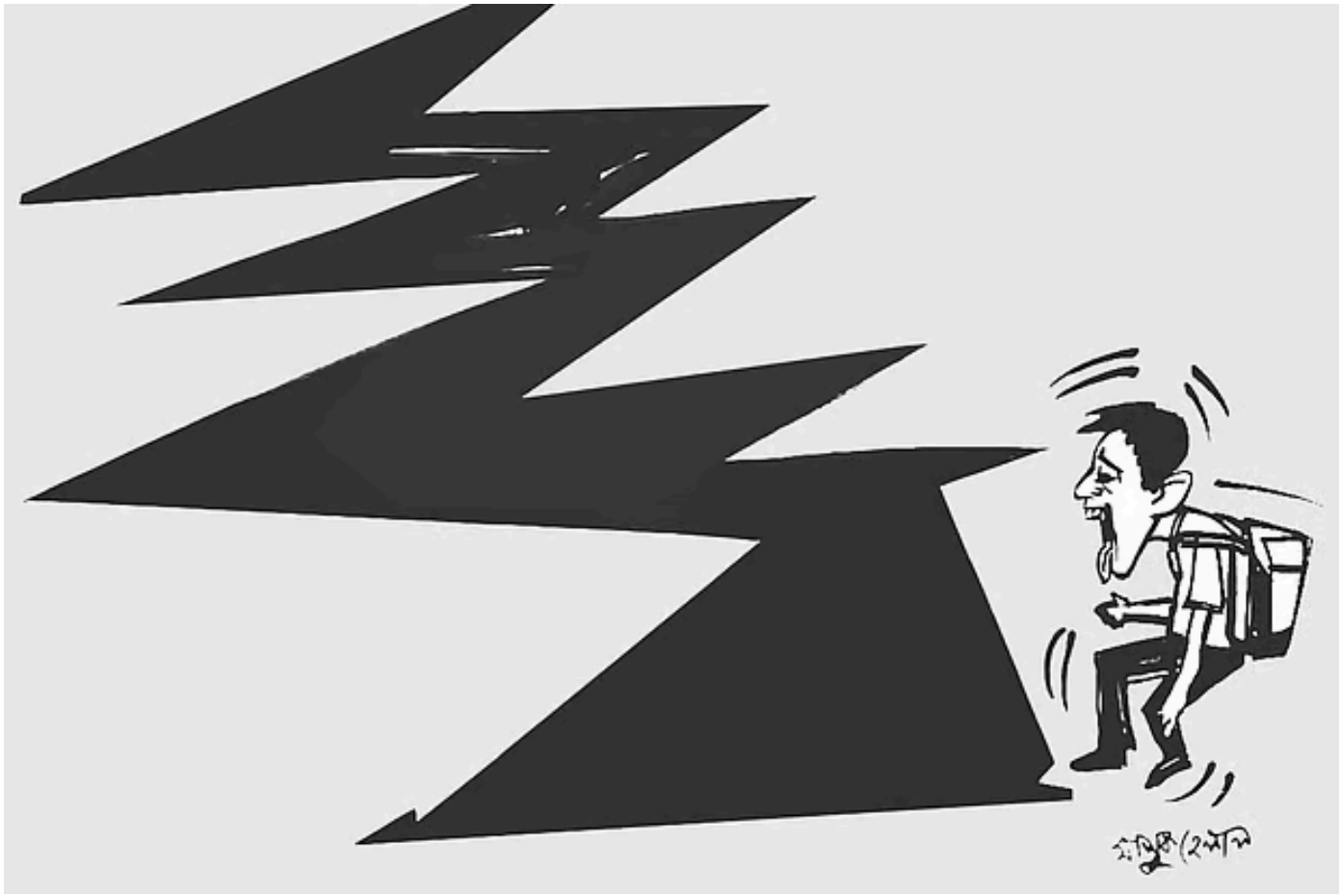

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ২৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে জাতির উদ্দেশে তাঁর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে বিগত সরকার। আমরা তার পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের উদ্যোগ নেব। এটা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার।

শিক্ষায় নৈরাজ্য বহুদিন থেকে চলে এসেছে। বিগত সরকারের শাসনের প্রথম দিকে মোটামুটিভাবে সর্বজন গৃহীত ২০১০ সালের শিক্ষানীতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সরকার তা বাস্তবায়নের জন্য কোনো সামগ্রিক উদ্যোগ নেয়নি।

অপরিকল্পিত, বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম ও সেসবের দুর্বল ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার নৈরাজ্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষিত অঙ্গীকার সত্ত্বেও শিক্ষায় সংস্কারের সামগ্রিক কোনো উদ্যোগ এখনো নেয়নি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি পরামর্শক কমিটি নিয়োগ দিয়েছে গত ৩০ সেপ্টেম্বর। ৯ সদস্যের কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কমিটি তার প্রতিবেদন ও সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করেছে। প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়ে সরকারের উদ্যোগ সাধুবাদযোগ্য, বিশেষত যদি সরকার সুপারিশ অনুযায়ী কাজ শুরু করে। কিন্তু দেশের শিক্ষাসমাজ ও সচেতন নাগরিকেরা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আগে থেকেই বলে আসছেন সমগ্র শিক্ষা খাতের সংস্কার ও উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়ন ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন নিয়োগ প্রয়োজন।

২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে স্থায়ীভাবে সংবিধিবদ্ধ এক কমিশন নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছিল। যুক্তি ছিল শিক্ষার মতো জটিল, বহুমাত্রিক ও জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নাগরিক নজরদারির জন্য ও সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি স্বাধীন কমিশন থাকা দরকার। কিন্তু বিগত সরকার এই পথে হাঁটেনি।

ছাত্র-জনতার ‘রাষ্ট্র মেরামতের’ দাবি ও প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কটি উচ্চমর্যাদার কমিশন গঠন করেছে। সাংবিধানিক, প্রশাসনিক, বিচারব্যবস্থাসংক্রান্ত এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১১টি কমিশন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের জন্যও কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার জন্য তা করা হয়নি, প্রাথমিক শিক্ষার পরামর্শক কমিটি ব্যতীত। ব্যাপকভাবে উত্থাপিত দাবি সত্ত্বেও শিক্ষা কমিশন গঠনে সরকারের দ্বিধা কেন?

একটি কমিশন গঠন করলেই শিক্ষার বেসামাল ও অস্থির পরিস্থিতি শান্ত হবে, তার নিশ্চয়তা কী আছে? শিক্ষা সংস্কারের কমিশন কাকে নিয়ে গঠিত হতে পারে; কী ধরনের বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ তারা দেবে—এসব প্রশ্নও রয়েছে। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, শিক্ষা কমিশন স্থাপন এবং এর সম্ভাব্য সুপারিশ বহু সংবেদনশীল বিষয় সামনে নিয়ে এসে এক ‘প্যানডোরার বাক্স’ খুলে দিতে পারে। বহুদিনের অবহেলিত অভিযোগ ও পুঞ্জীভূত সব দাবিদাওয়া নিয়ে অনেকে রাস্তায় নেমে পড়তে পারেন।

১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনালগ্নে প্রণীত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদনকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সাম্য এবং মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়ভিত্তিক দেশ গঠনের ভাবনা প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এ নিয়ে কোনো কাজ হাতে নেওয়ার আগে ১৯৭৫ সালে সামরিক শাসকেরা এই প্রতিবেদন হিমাগারে পাঠিয়ে দেন।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সামরিক শাসনকালে এবং ১৯৯১ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত নির্বাচিত সরকারের আমলে অন্তত আটটি শিক্ষা কমিশন বা কমিটি গঠিত হয়েছে। এসব উদ্যোগের অভিন্ন পরিণতি ছিল এগুলোর কোনোটিরই বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যেমনটি ঘটেছিল বিগত সরকার প্রণীত ২০১০ শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও।

শিক্ষায় কেন এই নিরন্তর অবহেলা? এই কাহিনি বাংলাদেশে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাধাগ্রস্ত হওয়ার বৃহত্তর ইতিহাসের অংশ। রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক কোনো শাসক দল নতুন রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দেয়নি। সে জন্যই দেখা যায়, সরকারের শিক্ষার জন্য বিনিয়োগে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে নিম্নতম দেশগুলোর মধ্যে রয়ে গেছে। জনতোষণবাদী বা কায়েমি স্বার্থ রক্ষাকারী নীতি গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। সেগুলোতে গ্রহণযোগ্য শিক্ষার মান রক্ষার চেষ্টা করা হয়নি।

ঢাকা শহরে তিতুমীর কলেজসহ সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের পথে নেমে জনদুর্ভোগ ও নিজেদের দুর্ভোগ ঘটিয়ে প্রতিবাদের পেছনে মূল কারণ এখানে। শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যথার্থ মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি। বাংলা মূলধারা, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা ধারায় বিভাজিত শিক্ষাসমাজের শ্রেণিবিভক্তি ও বৈষম্য বৃদ্ধি করে চলেছে।

তাহলে দীর্ঘকাল চলে আসা শিক্ষার গভীর বৈকল্য সমাধানে অন্তর্বর্তী সরকার বড় ভূমিকা রাখবে, তা কি দুরাশা নয়? হয়তো তা-ই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের প্রত্যাশাও আছে এ ব্যাপারে—রাজনৈতিক কিছু দল যা-ই বলুক। শুধু শিক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকা কি সমীচীন? তা ছাড়া সরকারের কি হাত গুটিয়ে বসে থাকার সুযোগ আছে?

চলমান বিশাল শিক্ষা আয়োজনে অনেক সিদ্ধান্ত সরকারকে নিয়ত নিতে হচ্ছে এবং নিতে হবে। সেগুলো নেওয়া হচ্ছে তাত্ক্ষণিক, বিচ্ছিন্ন ও অসমন্বিতভাবে—অনেক সময় আন্দোলন ও চাপের মুখে। পথে নেমে অবরোধ করে দাবি আদায়ের সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে। যা শিক্ষার্থী, শিক্ষাব্যবস্থা বা দেশের জন্য মঙ্গলজনক নয়।

শিক্ষার সংস্কার ভবিষ্যতের নির্বাচিত সরকারের জন্য রেখে দেওয়া হোক। এ যুক্তি ধোপে টেকে না। গত ৫৪ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনৈতিক সরকারগুলো এ ব্যাপারে যথেষ্ট সদিচ্ছা, সংকল্প ও দক্ষতা দেখায়নি। ভবিষ্যতে দেখাবে, সে আশা করতে পারি, কিন্তু সেই আশা নিয়ে কি এখন আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকব?

অন্য নানা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার উদ্যোগের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রেও অন্তত সংস্কার ও পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজটি করা দরকার। তা ছাড়া বিদ্যমান বিশাল শিক্ষা খাতের যেসব ছোট ও বড় সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে, সেগুলো যাতে সামগ্রিক শিক্ষা রূপান্তরের চিন্তাভাবনার আলোকে বিবেচিত হয়, সে চেষ্টা করা জরুরি।

শিক্ষার খাত-উপখাতে বহুমুখী ও বহুমাত্রিক বিচার-বিবেচনায় সাম্প্রতিক ধারার তিন মাসের কমিশন উপযুক্ত হতে পারে না। এ জন্য অন্তত ছয় মাস সময় দেওয়া যেতে পারে এবং কমিশনের পরিবর্তে এটিকে শিক্ষা পরামর্শক কমিটি বলে অভিহিত করা যেতে পারে। স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ মাথায় রেখে, স্থায়ী কমিশনের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত (হয়তো ভবিষ্যতের নির্বাচিত সরকার কর্তৃক) এই প্রস্তাবিত পরামর্শ কমিটিকে শিক্ষা খাতের সামগ্রিক নজরদারিতে সরকারের সহায়তাকারীর ভূমিকায় রাখা যেতে পারে।

- **ড. মনজুর আহমদ**, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্কের সভাপতি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের উপদেষ্টা

(নিবন্ধে ব্যক্ত মতামত লেখকের নিজস্ব)

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো